Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Zobayer Abdullah
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.9
Pages	১৮১-২০৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা: ১-২
কার্তিক ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৩
Issue DOI: 10.62328/sp.v58i1-2

DOI: 10.62328/sp.v58i1-2.9
প্রবন্ধ জমাদান: ২৯ জানুয়ারি ২০২৩
প্রবন্ধ গৃহীত: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রবন্ধ প্রকাশ: ২০ এপ্রিল ২০২৩
পৃষ্ঠা: ১৮১-২০৩

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব

জোবায়ের আবদুল্লাহ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: zobayer@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

গত শতাব্দীর শেষ চার দশকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথকতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) গল্পশিল্পের বিষয়বস্তু। স্বল্পপ্রসূ এ লেখকের গল্পসমূহে উন্মোচিত হয়েছে এদেশের কেন্দ্র থেকে প্রান্তস্পর্শী মানুষের দ্বন্দ্বজটিল জীবনবাস্তবতার স্বরূপ। বাংলাদেশের সমাজসংগঠনে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণিশোষণ ও প্রান্তিক মানুষের শ্রেণিচেতনায় উজ্জীবনের ইতিহাস ইলিয়াসের বেশ কিছু গল্পের উপজীব্য বিষয়। শ্রেণিসচেতন লেখক হিসেবে ইলিয়াস তাঁর গল্পে শ্রেণিবিভাজিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বসমূহ যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি শোষণমুক্তির প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের প্রতিও জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। বর্তমান প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি।

শ্রেণিবিভক্ত মানবসমাজের ইতিহাসকে কার্ল মার্কস সংজ্ঞায়িত করেছেন শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস[১] হিসেবে। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে বাংলাদেশের সমাজবিকাশের ধারাকেও এই ইতিহাসের অন্তর্গত বলে গণ্য করা যায়। এদেশের সমাজবিকাশের ধারায় যে শ্রেণি-দ্বান্দ্বিক জীবনের এক অনিবার্য বিকাশ ঘটেছে তার স্বাক্ষর লক্ষ করা যায় এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলায়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় শ্রেণিসংগ্রাম, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা বিরোধ-বিক্ষোভের যে ধারা ক্রিয়াশীল ছিল তার ভরকেন্দ্র ছিল ধর্ম[২]। বলা চলে ধর্মমতের বাতাবরণেই সেকালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্তর্গত শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংঘাত স্পর্শ করে সংবেদনশীল কবি-শিল্পীর চিত্তলোক। কারণ, 'সমাজজীবন থেকেই শিল্পীরা তাঁদের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আর শ্রেণীদ্বন্দ্বে আকীর্ণ সমাজজীবন থেকে তাঁরা যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাও শ্রেণীসংগ্রাম-আশ্রিত হবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য-আশ্রিত শ্রেণীসংগ্রাম, রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে সম্ভবত আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।' (হাননান, ১৯৯৪: ৩) মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণি ও সাহিত্যের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছিন্ন। সমাজ-মানসের ভাষিক ও নান্দনিক প্রকাশই সাহিত্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলমান অবিরাম শ্রেণিসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় সমাজের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি। আর এ শ্রেণিসংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট শ্রেণিচেতনা যেমন সমাজ-প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি এ শ্রেণিচেতনা থেকেই উন্মেষিত হয় সমাজপ্রগতির লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে সমাজপরিসরে বিদ্যমান এ শ্রেণিচেতনা ও প্রগতিমুখী ধারাকে ধারণ করে সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন

কালজয়ী কথাসাহিত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেই ধারারই অসামান্য রূপকার।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্বমুখর সমাজ ও তার বিবর্তনের রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে। মার্কসবাদী ভাবাদর্শে আস্থাশীল হয়েও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির প্রশ্নে ইলিয়াস সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যাদর্শকে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পক্ষপাতী ছিলেন না[৩]। বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর রূপ-রূপান্তরের সারধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখে তিনি সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিশোষণ, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যকার ব্যবধানসূত্র উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। ইলিয়াসে 'শ্রেণি-সচেতনতা জৈবিক উপাদানের মতো লেগে থাকে সামগ্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে। তার মধ্যেই কাঠামোগতভাবে সর্বব্যাপ্ত উপাদানের মতো মিশে থাকে মানুষ সম্পর্কে ইলিয়াসের ভাবনাবোধের নির্যাস।' (আজম, ২০১৪: ৪৮) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে পরম আস্থা সত্ত্বেও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ইলিয়াসের সাহিত্যে প্রায় বিরল। সাম্যবাদকে তিনি 'কাণ্ডজ্ঞান' (common sense) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সম্পদের সুষম বণ্টন-ভাবনা তাঁর পক্ষে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

লেখক শিবিরে যুক্ত হয়েও ইলিয়াস মার্কসবাদী তাত্ত্বিকতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি বরং তত্ত্বসর্বস্বতার পরিবর্তে তিনি সর্বদাই জীবন-সংলগ্ন হতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা এবং তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শের সারবস্তু তার তত্ত্বীয় আরোপণের পরিবর্তে সৃষ্টিশীল প্রকাশেই ইলিয়াসের অধিকতর মনোনিবেশ। যে জনগোষ্ঠীর জীবন তিনি সাহিত্যে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন সেই জীবন-সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞানই তাঁকে সাহিত্যের তাত্ত্বিক-রূপায়ণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। 'প্রকৃতপক্ষে কোনো তত্ত্বসাধনার প্রলেপ তাঁর লেখাকে আচ্ছন্ন করেনি। শিল্পের নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি জীবনের সমগ্রতাকে সাহিত্য-শিল্পে রূপ দিয়ে গেছেন।' (আসমা, ২০১৯: ৭২) ইলিয়াস প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বাশ্রয়ী সাহিত্য নির্মাণের বিরোধী হলেও একজন রাজনীতি-সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সাহিত্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ-পর্যায়ে তাঁর গল্পে শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রকাশ কীভাবে চিহ্নিত হয়েছে তা বিচার বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। এই গ্রন্থসমূহের বেশকিছু গল্পে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এগুলোর মধ্যে 'উৎসব', 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল', 'দখল' 'কীটনাশকের কীর্তি', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষয়বিচারে গল্পগুলোতে ভিন্নতা থাকলেও এদেশের রাষ্ট্রকাঠামো, সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতার বিন্যাস ও শ্রেণিশোষণের সূত্রসমূহ উন্মোচনের দিক থেকে এসকল রচনায় এক প্রকার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। ইলিয়াসের

গল্পে শ্রেণিদ্বন্দ্ব শ্রেণিসংঘর্ষে রূপলাভ করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি লক্ষ করা যায় না (ব্যতিক্রম 'দখল' গল্প)। তিনি বরং বিদ্যমান ব্যবস্থায় শ্রেণিশোষণের বহুমাত্রিক রূপ চিত্রায়ণে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। ফলত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের এক অনিবার্য প্রসঙ্গ।

অন্য ঘরে অন্য স্বর

ষাটের দশকের বাংলাদেশের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে ইলিয়াসের 'উৎসব' নামক গল্পে। সামাজিক মানুষের স্বপ্নময় জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার অপ্রাপ্তিজনিত বেদনায় ব্যক্তিচিত্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, 'তার অন্তর্গত ক্ষয়, ক্ষোভ ও বিদ্রোহ' (শামিমা, ২০১৬ : ৪১) স্থান পেয়েছে গল্পটিতে। গল্পে দুটি ভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবন-প্রতিবেশের চিত্র মুদ্রিত হয়েছে দুটি পৃথক উৎসবকে কেন্দ্র করে। একটি উৎসবের ভিত্তিভূমি ধানমণ্ডির জাঁকজমকপূর্ণ একটি বউভাতের অনুষ্ঠান, অন্যটি শতচ্ছিন্ন পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি পরিবেশে একজোড়া কুকুরের রতিদৃশ্যের উৎসব। আর এ উভয় উৎসবের যোগসূত্র আনোয়ার আলি। দুটি ভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে ইলিয়াস গল্পটিতে উন্মোচিত করছেন ষাটের দশকের বিকাশমান ঢাকা শহরের মানুষের শ্রেণিগত অবস্থানের পার্থক্যসূত্র এবং তাদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের রূপরেখা। নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি আনোয়ার আলির জীবন-প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে এ-গল্পের ঘটনাংশ বলয়িত হলেও গল্পটি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির গল্প না হয়ে শ্রেণির গল্প হয়ে উঠেছে। নগর ঢাকার নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন-অভীপ্সা ও সমাজসত্যের নিগূঢ় অন্তঃসত্য উন্মোচনের প্রয়াস গল্পটির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ।

গল্পের নায়ক আনোয়ার আলি ষাটের দশকের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সময়ে কলেজবন্ধুদের সঙ্গে বামপন্থি আন্দোলনে যুক্ত হলেও পরবর্তীকালে বন্ধুদের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। বিএ পাস সমাপ্ত করে সামান্য কেরানির জীবন যাপন করতে হয় তাকে। রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকার পরিবর্তে তার ঠিকানা হয় পুরনো ঢাকার নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন-পরিসরে। কিন্তু কলেজবন্ধু বিত্তবান পরিবারের সন্তান কাইয়ুমের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আনোয়ার আলি মুখোমুখি হয় অন্তর্গত নানা সংকটের। বউভাতের উৎসবে আগত সমাজের উচ্চশ্রেণির নরনারীর আচার-উচ্চারণ ও অভ্যাসের সঙ্গে সে যেমন নিজের শ্রেণি-অবস্থানের প্রতিতুলনার সুযোগ পায় তেমনি তার কাঙ্ক্ষিত-জীবনের অপ্রাপ্তিজনিতবোধও তাকে করে তোলে বেদনাদীর্ণ। ফলে উৎসবের পরিসমাপ্তিতে পুরনো ঢাকায় নিজেদের সরু গলির নোংরা পরিবেশ লক্ষ করে সে বেদনাহত হয়ে পড়ে। বৌভাতের অনুষ্ঠানে 'ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা'র পর স্ত্রী সালেহা বেগমের দেহসৌষ্ঠব তার মধ্যে তীব্র বিরক্তির ভাব উদ্রেক করে। কারণ, বছরখানেক কলেজে পড়া সালেহার মধ্যে নেই নিজেকে পরিপাটিভাবে উপস্থাপনের সচেতন অভিলাষ;

'এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই পাছা নেই। দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৩) একারণে সালেহার সঙ্গে নিদ্রা-পূর্ববর্তী রতিক্রিয়ার কালে স্ত্রীর পরিবর্তে অনুষ্ঠানে আগত বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আলাপের স্মৃতি হয়ে ওঠে পরিতৃপ্তির বিষয়। সালেহার শরীর-সান্নিধ্য পেয়েও আনোয়ার অনুভব করে তার হাতে লেগে আছে রাবারের 'শকপ্রুভ গ্লাভস'। আর এ-পর্যায়ে ইলিয়াস গলির মুখে ল্যাম্পোস্টের নিচে একজোড়া কুকুরের রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আয়োজন করেন গল্পের দ্বিতীয় উৎসব। 'জনতা কুকুররতি দ্যাখার উৎসবে মুখর, তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৯) প্রতিবেশী নসরুল্লা সর্দার, রুটি দোকানের মালিক তোতামিয়া, তার কর্মচারী জুম্মন আলি প্রত্যকেই যোগ দেয় কুকুররতি দেখার উৎসবে। বিকৃতরুচির দর্শকদের গালিগালাজ করে আনোয়ার আলিও শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এ উৎসব দেখে আনোয়ার আলি তার সঙ্গমতাড়না ফিরে পায়। তার হাতের অদৃশ্য রাবারের গ্লাভস খুলে যায়; স্ত্রীর সঙ্গে সে অনুভব করে মিলনের আকুলতা।

'উৎসব' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে ষাটের দশকের বাংলাদেশের সম্প্রসারণশীল ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যকার জীবন ও সংস্কৃতির ব্যবধানসূত্র। ব্রিটিশ উপনিবেশের অবসানের মধ্য দিয়ে এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রবেশ করেছিল আরেকটি নব্য-ঔপনিবেশিকতার শাসনগর্ভে। নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা ধানমণ্ডিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিত্তশাসিত মানুষের বিলাসী জীবনের পাশাপাশি নগরের আরেক প্রান্তে পুরানো ঢাকায় দেখা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনপ্রবাহ। ধানমণ্ডির বিত্তবান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুরনো ঢাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনাচারের সুস্পষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় গল্পটিতে। স্বভাবতই রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকেন্দ্রের চূড়ায় অবস্থিত শ্রেণিটির সঙ্গে পুরনো ঢাকার সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্ক রূপায়ণই গল্পের অন্তঃসত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ধানমণ্ডির অভিজাতশ্রেণির মানুষের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে আনোয়ার আলির পর্যবেক্ষণে:

> ধানমণ্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃণ, নোতুন ও টাটকা। ... সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মনিমুক্তাখচিত বড়ো বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে তুলতে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল. পি চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘণ্টা কণ্ডিশনের ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২২-২৩)

ধানমণ্ডির উচ্চশ্রেণির মানুষের জীবনপদ্ধতি ও সংস্কৃতিচর্চার চিত্র উন্মোচনসূত্রে ইলিয়াস এ শ্রেণিটিকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। আর এর বিপরীতে তিনি উপস্থাপন করেছেন পুরনো ঢাকার নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-প্রতিবেশের প্রাত্যহিক রূপচিত্র; যেখানে 'গলির নালায় হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ ও কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ২২) নাইট শো শেষে মেয়েদের ফেরার দৃশ্য দেখার জন্য তরুণ সমাজের 'পাঁয়তারা', গলির মধ্যে বড়ো রাস্তায় জুয়ার আড্ডা কিংবা আহমদিয়া রেস্টুরেন্টে বিরামহীনভাবে কর্কশভাবে বেজে চলা 'ছোড়ে বাবুলকা ঘর' এর সবই শ্রমজীবী মানুষের নির্মেদ জীবনবাস্তবতার চিত্র। দুই ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের এই আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিরোধ-বৈপরীত্যের চিত্র উপস্থাপন করে ইলিয়াস মূলত শ্রেণিবিভক্ত সমজের অন্তর্গত বিরোধের সূত্রগুলো উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ বিরোধ 'ধানমণ্ডির ও পুরনো ঢাকার; উচ্চবিত্ত অভিজাতের ও নিম্নবিত্ত নিম্নশ্রেণির সামাজিক সাংস্কৃতিক বিরোধ' (আলাউদ্দিন, ২০১৬: ২৫) মানবজীবনপ্রবাহের পাশাপাশি এ দুই শ্রেণির মধ্যকার ব্যবধানের চিত্র ফুটে উঠেছে দুই অঞ্চলের কুকুরের মধ্যেও। আনোয়ার আলির অনুসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ:

> ... কুকুর কি আর ওদিকে নেই? ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কী গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তাঁর চেহারা! কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু মৃদু। মনে হয় বাংলা ফিল্মের জমিদার বাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে।
>
> আর দ্যাখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দ্যাখো! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুই কুই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো কোনো ছোটো লোকের বাচ্চার মতো যা তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৩)

ষাটের দশকের বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকা চাকচিক্যময় হয়ে উঠতে শুরু করলেও অন্ধকারে থেকে যায় পুরনো ঢাকার নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। 'শহরে অভিজাত এলাকায় পালিত কুকুর ও গলির বেওয়ারিশ কুকুরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বস্তুত লেখক শোষিত-ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ চিত্রেরই' (সরিফা, ২০০৯: ২৭২) পরিচয় উন্মোচন করেছেন। ধানমণ্ডির উৎসবমুখর বর্ণাঢ্যজীবনপ্রবাহ যেমন আনোয়ার আলির ব্যক্তিজীবনের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাকে প্রগাঢ় করে তোলে তেমনি তার মনস্তত্ত্বও হয়ে ওঠে জটিলতর। উৎসবে আগত বন্ধুদের প্রত্যেকেই বর্তমানে সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিচারে আনোয়ার আলির চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে। একসময়ের বাম রাজনৈতিক কর্মী হাফিজ বর্তমানে কলেজের অধ্যাপক, তার স্ত্রীও সম্ভ্রান্ত পরিবারের

মেয়ে। ছাত্রাবস্থায় তুখোড় বক্তা ইকাবাল হোসেন চৌধুরী পশ্চিম ইয়োরোপের এক রাজধানীতে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বরত; অন্যদিকে বন্ধু কাইয়ুমও উচ্চবিত্ত বাবার সন্তান। কলেজজীবনে এই বন্ধুদের সঙ্গে আনোয়ার শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল। কিন্তু একই রাজনৈতিক আদর্শকে ধারণ করলেও বন্ধুরা প্রত্যেকেই যখন সে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজে নিজ নিজ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তখন আনোয়ার আলির জীবনে এসেছে কেবল নিরুপায় ব্যর্থতা। একদিকে নিজের পেশাগত ও দৈন্যপ্রপীড়িত সংসারজীবন, অন্যদিকে বন্ধুদের ঈর্ষণীয় সাফল্য তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে ক্ষোভ ও হতাশা। আর একারণে সে পুরনো ঢাকার মানুষের মধ্যে লক্ষ করে রুচিহীনতার প্রকাশ; স্ত্রীর আচরণে খুঁজে পায় গ্রাম্য স্থূলতা। ফলে অনুষ্ঠানে আগত নারীরা তার নিকট আকর্ষণের বিষয় হলেও স্ত্রী সালেহার প্রতি তার কামবোধের কোনো প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। বরং সান্ধ্যকালীন উৎসবকে কেন্দ্র করে 'ভালো ভালো মেয়ে দেখার মূল্যবান স্মৃতি' হয়ে ওঠে তার আকাঙ্ক্ষার বিষয়। 'সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ্য মাত্র'। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৭) কিন্তু উৎসবের নারীরা শেষ পর্যন্ত আনোয়ারের কল্পনার বাইরে থেকে যায়। ইলিয়াস জানিয়েছেন 'সেক্সুয়াল ইমাজিনেশনে'র সঙ্গে ক্লাসের রয়েছে ওতপ্রোত সম্পর্ক[৪]। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত তার 'সেক্সুয়াল পার্টনারকে ডমিনেট করতে চায়। কিন্তু আনোয়ার আলীর শ্রেণি-অবস্থানের কারণে উচ্চবিত্ত নারীকে সে তার কল্পনাতেও অধিকার করতে পারে না। এভাবে 'ব্যক্তিকে, ব্যক্তির ব্যাধিকে, তার সম্পর্কের বিন্যাসকে ইলিয়াস দেখেন শ্রেণির প্রেক্ষায় ও শর্তে' (আলাউদ্দিন, ২০১৬: ২৮) 'সেক্সও যে শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়'[৫] আনোয়ার আলির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গল্পে এ সত্যই উন্মোচিত হয়েছে।

মানুষের প্রতি গভীরতর মমত্ববোধ সত্ত্বেও ইলিয়াস এ-গল্পে মেকি 'মানবিকতা বিলাসী'দের বিপরীত পথযাত্রায় অগ্রসর হয়েছেন। 'মানবিকতার ধারণাকে মুগুর দিয়ে চূর্ণ করেছেন ইলিয়াস। মানুষ আর কৃমিকীটের অস্তিত্বের মধ্যে কোনো তফাৎ করতে চাননি।' (হাসান, ২০১৮: ৫৬) এক্ষেত্রে ইলিয়াসের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে কল্লোল তথা প্রকৃতিবাদী সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে, যা ডারউইন-পরবর্তী জীববিজ্ঞানের এ-ভাবনা থেকে উৎসারিত যে মানুষ কেবল উন্নতশ্রেণির এক প্রাণী মাত্র[৬]। আর একারণে ইলিয়াস এ-গল্পে কুকুর আর মানুষের মধ্যে কোনো ভেদরেখা নির্মাণ করেননি। মানুষের পাশবিক লোভ-লালসা, যৌন-ঈর্ষার তাড়নাকে ইতর প্রাণীর সঙ্গে একাকার করে উন্মোচন করাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট।

নির্মোহ সমাজচৈতন্যের আলোকে মানবজীবনের সানুপুঙ্খ উপস্থাপনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে 'উৎসব'। গল্পটিতে ইলিয়াস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে আনোয়ার আলি ও তৎসন্নিহিত যে জীবনচিত্র উন্মোচন করেছেন তা তৎকালীন ঢাকার বাস্তবতার সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলত 'উৎসব' হয়ে উঠেছে দেশভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিশ্বস্ত প্রতিরূপ।

দুধভাতে উৎপাত

বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ সামাজপটভূমিতে কীভাবে শ্রেণিশোষণের শিকার হয়ে একটি নির্বিত্ত পরিবার যাপন করে উপবাসী জীবন এবং এই শ্রেণিশোষণজনিত বোধ কীভাবে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে প্রতিরোধের স্পৃহা সেই বাস্তবতা অঙ্গীকৃত হয়েছে 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে। গল্পটিতে যে শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায় তা গল্পের উপান্তে শ্রেণিসংঘাতের দিকে ক্রম অগ্রসরমান থেকেছে। ধলেশ্বরী নদীতীরবর্তী জনপদের একটি গ্রামে মৌলবি কসিমুদ্দিন ও জয়নাবের ছয় সদস্যের নিত্য অভাবের সংসার। সংসার থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে কসিমুদ্দিন। তিস্তাপারের খোলামহাটি গ্রামে আজমত আলী প্রধানের আশ্রয় ও আনুকূল্যে বাড়ির মক্তবে পাঠদান এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের চাকরিকে কেন্দ্র করে সে বেশ দাপটের সঙ্গে অবস্থান করলেও নিত্য অভাবের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে তার পরিবার। অভাবের সংসারে কোরবানি ইদ-পরবর্তী সময়ে অ্যালমুনিয়ামের ডেকচি বোঝাই ৮-১০ সের গোরু-খাসির মাংসসহ আগমন ঘটে তার। আর তখন 'একটা মাস গোশ্তের ঝোলের, গোশ্তের ভুনার, কলেজি-গুর্দার সুবাসে... ছনের ঘরে দালানের চেকনাই আসে।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৮৫) কিন্তু বছরের অবশিষ্ট সময় প্রাত্যহিক ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য তার স্ত্রী-সন্তানদের যেতে হয় অন্তহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটি কালো গাইয়ের দুধ বিক্রির অর্থে একসময় কসিমুদ্দিনের পরিবারটির আহার-অন্নের সংস্থান হলেও আধমণ চালের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সেই গোরুটিও প্রভাবশালী হাশমত মুহুরির হস্তগত হয়। স্ত্রী জয়নাবের প্রত্যাশা ছিল স্বামীর পাঠানো টাকায় চালের মূল্য পরিশোধ করে গরুটি আবার ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু পরিবারের প্রতি কসিমুদ্দিনের উদাসীনতা সম্পর্কেও সে সচেতন। 'মোল্লায় খাইয়া দাইয়া প্যাটটিরে বানাইছে গোশতের কালাপাতলা, হ্যায় ট্যাহা পাঠাইবো ক্যান?' (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৯১) ফলে খাদ্যাভাবে উপবাসই হয়ে ওঠে পরিবারটির নিত্য সঙ্গী। একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্যদিকে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগতে থাকা জয়নাবের মধ্যে একপর্যায়ে জাত হয় সন্তানদের মুখে দুধভাত তুলে দেওয়ার আকুতি। নিজেদের কালো গাইয়ের দুধের জন্য বড় ছেলে অহিদুল্লা হাশমত মুহুরির বাড়িতে উপস্থিত হলে পরিবারের সদস্যরা নির্মমভাবে তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে। দুধের সংস্থান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত চালের গুড়ি সন্তানদের 'দুধভাত' হিসেবে খাওয়ানোর সময় মৃত্যু হয় জয়নাবের। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে সে অহিদুল্লাকে গোরু ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলে ওহিদুল্লাহ সে আদেশ পালনে তৎপর হয়।

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পটিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। জয়নাব ও তার সন্তানেরা দরিদ্র এবং একই সঙ্গে শোষিতশ্রেণির অন্তর্গত। বলা যায়, শোষণই তাদের এই দারিদ্র্যের একমাত্র কার্যকারণ। অন্যদিকে গল্পে হাসমত মুহুরি, মুহুরির স্ত্রী, ছেলে আশরাফ, আলতাফ, জামাই হারুন মৃধার আবির্ভাব ঘটেছে শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেদের কালো গোরুর দুধ আনতে হাসমত মুহুরির বাড়িতে উপস্থিত

হলে অহিদুল্লার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের আচরণে যে নির্দয়তা ও অমানবিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাতে উন্মোচিত হয় গ্রামজীবনকেন্দ্রিক শ্রেণিশোষণের স্বরূপ। অভাবগ্রস্ত জয়নাবের পরিবারের সর্বস্ব হারানোর ইতিবৃত্ত গল্পটিতে ব্যক্ত হয়েছে অল্পকথায়:

> কালো গোরুর কথাটা হারুন মৃধা ভুলতে পারে না, 'এইগুলির উপকার করতে নাই। খাওন জোটে নাই, চাউলের দাম হইলো আগুন, ভাইজানে গোরুটা কেনে তয় হ্যাগো চাউল আসে! দানাপানি জোটে! হাটে বাজারে অহন আলার বাপে কইয়া বেড়ায়, হ্যার ভাই বাড়িতে থাকে না, মউরির পোলায় হ্যার গাইগোরু লইয়া গেছে। গোরু লইছে মাগনা? ক্যারে, গোরু তর মায়ে মাগনা বেচছে?' (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৮৯)

অর্থাৎ হারুন মৃধা এবং তার পরিবার অহিদুল্লাদেরকে যেমন তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তেমনি শ্রেণিশোষণের ধারাকেও রাখে বহমান। শুরুতে অহিদুল্লাহ এ শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেনি, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেওয়া গোরু ফিরিয়ে আনার 'হুকুম তালিম' করতে সে তৎপর হয়ে ওঠে। তার 'পায়ের পাতা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য শিরশির করে। এতো বমির পর নির্ভার মায়ের মুখের যে কঠিন চেহারা হয়েছে তাতে তার হুকুম তামিল না কলে ওহিদুল্লার কি রেহায় আছে?' (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৯৫) মায়ের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে অহিদুল্লাকে প্রদত্ত নির্দেশ এবং এ নির্দেশ পালনে অহিদুল্লার সজাগ-সক্রিয়তা গল্পটিকে ইতিবাচক জীবনভাবনায় ভাস্বর করে তুলেছে।

শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব এ গল্পে পূর্বাপর ক্রিয়াশীল থেকেছে। অস্তিত্ববিনাশী শ্রেণিশোষণে নিমজ্জিত পরিবারটির সদস্যদের শোষণ-শৃঙ্খলকে ছিন্ন করবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা গল্পটির মৌল প্রণোদনা। জয়নাবের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে লেখক শেষ পর্যন্ত এ শোষিতশ্রেণির পরাভবের চিত্র অঙ্কন করেননি বরং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে শ্রেণি-অধিকার সম্পর্কে তার সক্রিয়তা জীবনের প্রতি লেখকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকেই করেছে পুনর্ব্যক্ত।

বাংলাদেশের শোষণমূলক সমাজ-অন্তর্গত শ্রেণিদ্বন্দ্বের পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'পায়ের নিচে জল' গল্পের বিষয়াংশে। গল্পটিতে যে বাস্তবতা অঙ্গীকৃত হয়েছে সেখানে একদিকে যমুনার হিংস্র ছোবল, অন্যদিকে আলতাফ মৌলবিদের অনিঃশেষ ভূমিগ্রাস, দুয়ের অনিবার্য পরিণতিতে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে বাংলাদেশের গরিব কৃষক' (আলাউদ্দিন, ২০১৬: ১২৩)। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর দুইভাইয়ের পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আতিক পৈতৃক জমি বিক্রির উদ্দেশ্যে উঠতি গ্রামীণ জোতদার আলতাফ মৌলবির শরণাপন্ন হয়। পিতা করিম সাহেব আলতাফ মৌলবির নিকট জমি বর্গা দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন; কিন্তু পিতার অবর্তমানে তার কাছেই সমস্ত জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় আতিকের পরিবার। ধানমণ্ডির বাড়ির তৃতীয়তলার কাজ, গুলশানের প্লটে বাড়ি নির্মাণ আর মেজো ভাইয়ের হার্ভার্ডে পড়ার খরচের যোগান দিতেই মূলত আতিকের পরিবার এ সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। জীবিতাবস্থায় করিম সাহেবের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকলেও নগর ঢাকায় বেড়ে ওঠা আতিক গ্রামজীবনের সঙ্গে ছিল নিতান্ত

সম্পর্কশূন্য। গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক কিসমত সাকিদারের সঙ্গে আতিকের পিতার ছিল বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক। মূলত তার অনুরোধেই করিম সাহেব জমিবিক্রি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং তারই ওপর অর্পণ করেন জমিজমা দেখভালের দায়িত্ব। ফলে আতিকদের জমিতেই গৃহনির্মাণ ও বর্গাচাষের মাধ্যমে কিসমত সাকিদারের পরিবার তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। অন্যদিকে করিম সাহেবের জমিগ্রহণে ব্যর্থ হলেও আলতাফ মৌলবি গ্রামপরিসরে চলমান রাখে নিম্নবিত্ত মানুষের ভূমিগ্রাসের প্রয়াস। যমুনা-তীরবর্তী মানুষ একদিকে নদীভাঙন অন্যদিকে আলতাফ মৌলবির ভূমিগ্রাসের শিকার হয়ে বসতবাড়ি হারিয়ে আশ্রয় নেয় সরকারি বাঁধের ওপর। কিন্তু বাস্তুচ্যুত এ নিরবলম্ব জনগোষ্ঠীও আলতাফ মৌলবির বিরক্তির বিষয়ে পরিণত হয়। কারণ, এর ফলে নিকটবর্তী থানা, স্কুল ও হাসপাতাল নদী ভাঙনের কবলে পড়ে বিলীন হলে ছন্দপতন ঘটবে তার ক্ষমতাকেন্দ্রিক নিরাপদ জীবনের। জমিবিক্রির সিদ্ধান্ত বর্গাচাষি কিসমত সাকিদারকে জানানোর উদ্দেশে আতিক গ্রামে এলেও তার মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার কারণে সে তার বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে আলতাফ মৌলবি বিষয়টি তার নিকট খোলাসা করে। আতিকদের জমিবিক্রির সিদ্ধান্তের খবরে বিপন্নবোধ করে নির্বিত্ত পরিবারটি। গল্পের উপান্তে কিসমত সাকিদার ও তার বাতব্যাধিগ্রস্ত পুত্র আসমতের অনুনয়, বড়ছেলের বউয়ের প্রতিবাদমুখর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর আকালুর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে অস্বস্তিকর এক অবস্থার মধ্যে পড়ে আতিক ও আলতাফ মৌলবি দ্রুত ওই স্থানত্যাগে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামজীবনের আর্থ-সামাজিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রচিত এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে একটি শ্রেণির উত্থান এবং শ্রেণি-পরিবর্তনের অভিঘাতে বিপর্যস্ত অন্য একটি শ্রেণির মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণার ইতিহাস। সাধারণ মানুষের ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে আলতাফ মৌলবির ভূমিকা এবং তার আচরণ ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাকে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে শনাক্ত করা যায়। হতদরিদ্র মানুষগুলোর জমি সে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করলে অভাবী মানুষগুলো হয়ে পড়ে ভূমিহীন, নিরবলম্ব। বিপন্ন মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে পুঁজি করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠনের মাধ্যমে সে ক্রমাগত নিজের সম্পদ বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। দুর্দিনে মানুষের অসাহায়ত্বের সুযোগে আলতাফ মৌলবির ভূমি দখলের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে আকালুর বক্তব্যে:

> আকালের বছর গাঁয়ের ছয় আনি জমি তো তাঁই নিলো। কিসের ট্যাকা, কিসের দাম, কয় মণ ধান দিয়া কয়, চল রেজিস্টি অফিসত চল। কতো দলিল করা নিছে তার বলে হিসাব কিতাব নাই। মানষেক ভিটা ছাড়া করছে, মানষে এখন বান্দের উপরে ঘর তুললে তার গোয়া কামড়ায়। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২০৭-২৮)

অন্যদিকে আতিকদের জমিতে কিসমত সাকিদারের পরিবার মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেও এ জমির ওপর আলতাফ মৌলবির ছিল তীক্ষ্ণ নজর। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় আতিকের পিতার বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের কারণে। আতিকের পিতার মৃত্যুতে আলতাফ

মৌলবির এ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মনোবাঞ্ছা পূরণের পথ প্রসারিত হয়। কিন্তু সুদীর্ঘকালের শোষণ-পীড়নের ফলে এ জনপদের মানুষের মধ্যে যে প্রতিরোধের মনোভাব জাগ্রত হয়েছে তা তার অজানা থাকে না। শোষণশৃঙ্খলের বিরুদ্ধে মানব-ঐক্য ও শ্রেণিগত প্রতিরোধের ভয় তাই তাকে তাড়িত করে। ফলে একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করতে ভূমি মালিক আতিককে সামনে রেখে আলতাফ মৌলবি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়। গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

> আলতাফ আলী রাতে সব বলেছে। এইসব লোকজন দিনদিন বড়ো আনরিজনেব্‌ল হয়ে উঠছে। কিসমত সাকিদারের জোয়ান জোয়ান সব ছেলে। মুক্তিযুদ্ধে খতম হইছে একটা, আর একটা ধান কাটতে গেছে পশ্চিমে খিয়ার এলাকায়। দুটো আছে বাপের সঙ্গে। এদের একটি বাতে পঙ্গু। শেষ সন্তান আকালু বাপের সঙ্গে আতিকদের জমি চাষ করে। এই জমি থেকে ওদের উচ্ছেদ করা একটু কঠিন বৈ কি! এই ঝুঁকি কভার করার জন্যে আলতাফ মৌলবি দামও কিছু কম দিতে চায়। মৌলবির দ্বিতীয় শর্ত হলো এই যে আতিককে নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জমি বেঁচে তো ওরা খালাস, জীবনে কি আর এমুখো হবে? সব সামলাতে হবে এই আলতাফ আলী খানকেই। গত কয়েক বছরে গ্রামে মেলা রক্ত বয়ে গেছে, ভদ্রলোকদের মান-ইজ্জত সব ধুয়ে মুছে সাফ। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২০৩)

অর্থাৎ শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে শ্রেণিদ্বন্দ্ব কীভাবে ক্রমশ শ্রেণিসংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করছে। এক পর্যায়ে শহর থেকে আগত আতিকও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এই ভেবে—'ওরা কি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' ভূমিরক্ষায় কিসমত সাকিদার ও তার ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের শত অনুনয়-বিনয়ের সমান্তরালে আতিক লক্ষ করে বাড়ির পুত্রবধূর প্রতিবাদী মুখাবয়ব:

> এখানে বেড়ার আড়ালে দাঁড়ানো বড়োছেলের বৌয়ের ঘোমটা একেবারে খসে পড়েছে। তার গোটা মুখটা এখন স্পষ্ট দেখা যায়। ডান চোখটা তার কানা, সেই চোখের অব্যবহৃত আলো ও শক্তি কি তার বাঁ চোখে উপচে পড়ছে? সেই ঝকঝক-করা চোখের দিকে একবার তাকিয়ে আতিককে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২১১)

ভূমি-দখল প্রক্রিয়ায় প্রতাপশালী আলতাফ মৌলবির দুই ছেলের একজন মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী, অন্যজন জেলা খাদ্য অফিসের পিওন। কিন্তু এতেও তার ভূমিক্ষুধা প্রশমিত হয় না বরং কাঁচা টাকার প্রাচুর্য তাকে এ শোষণক্রিয়ায় আরো বেশি আগ্রাসী করে তোলে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় যে বিস্তর প্রভেদ সেটিও স্পষ্ট হয়েছে গল্পটিতে। 'উৎপাদনের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, উৎপন্ন ফসল থেকে তারা প্রায় বঞ্চিত। আবার সেসব জমি গ্রাম্য জোতদার-টাউটদের (আলতাফ মৌলবি) কাছে বিক্রি করার ফলে একদিকে বর্গাচাষি ও কৃষকেরা নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষের খলে হাতে নিতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে শোষণকে স্থায়ী করার জন্য শক্ত হচ্ছে জোতদারের ভিত্তি।' (জাফর, ২০১২: ৭৮) অন্যদিকে নগরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত আতিকের পরিবারও

নাগরিক পরিবেশে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে তৎপর হয়েছে। আর এ কারণে কিসমত সাকিদারের নিরবলম্ব পরিবারটির শত নিবেদনেও তারা কর্ণপাত করেনি। বরং তাদের উচ্ছেদ করা জমি বিক্রির মাধ্যমে গুলশানে বাড়ি করে সমাজতান্ত্রিক দেশের এমব্যাসিকে ভাড়া দিয়ে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের বাসনা লালন করেছে আতিকের বড়ভাই। শ্রেণিশোষণের অবসানের পরিবর্তে নিজেদের শ্রেণি-অবস্থানকে সুসংহত করার এই সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে সুবিধাবাদী বামরাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়টি। ইলিয়াস তাঁর অধিকাংশ গল্পের মতো এখানেও বামরাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সুবিধাবাদী শ্রেণিচরিত্রকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন।

আলতাফ মৌলবি ও আতিকের পরিবার সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও নির্বিত্ত কিসমত সাকিদারের পায়ের নিচের সামান্যতম ভূমিও দখল করতে তৎপর ছিল। বংশপরম্পরায় বর্গাচাষের মাধ্যমে 'জমির খেদমত' করে পরিবারটি অস্তিত্বের যে দীপশিখা জ্বেলে রেখেছিল তাকেও তারা নিভিয়ে দিতে চায়। আর এজন্য ধর্মের দোহাই দিতেও আলতাফ মৌলবি কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তার এ দুরভিসন্ধি ও শোষণমূলক তৎপরতা আকালুর কাছে দিনের আলোর মতোই হয়ে ওঠে দীপ্যমান। এতৎপ্রসঙ্গে আলতাফ মৌলবি ও আকালুর কথোপকথন লক্ষণীয়:

> কয় পুরুষ থ্যাকা এই জমির খেদমত করল্যাম। এই ভিটা ছাড়লে আমরা কৈ যাই? মৌলবি চাচমিয়া কি আমাগোরে এটি থ্যাকবার দিবো?' আলতাফ মৌলবি পানের পিক ফেলে, ঢোঁকও গিললো একটা, তার চোখে মুখে দাড়িতে পবিত্র বৈরাগ্য ফিরে এসেছে। তার গলায় এখন ওয়াজের ওদাত্ত স্বর, 'বাপু জমি কও জিরাত কও রেজেক কও আহার কও—সবই আল্লার হাতে। মানুষ ক্যাডা? কওসে মানুষের তৌফিক কয় পয়সা? মানুষ জানে কী? মানুষ করবো কী? আল্লায় কার জায়গা কোটে রাখছে আমি কবার পারি, না তুই পারস?'
>
> 'আমি পারি।' আকালু সামনে এগিয়ে আসে, 'আমাগোরে জায়গা রাখছে বান্দের উপরে।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ২১১-২১২)

ভূমিগ্রাসী আলতাফ মৌলবির সৃষ্ট শোষণ-প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষের বাঁধের ওপর আশ্রয় গ্রহণের নির্মম ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আকালু তার পরিবারের ভবিতব্য বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। শ্রেণিশোষণের নিগূঢ় অন্তঃসত্য অক্ষরজ্ঞানহীন আকালুর নিকট সুস্পষ্ট হলেও এর প্রতিবিধানে কোনো সাংগঠনিক সক্রিয়তা গল্পটিতে ভাষারূপ অর্জন করেনি। তবে গল্পের অন্তিমে বাঁধভাঙার আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত আতিকের দ্রুত পলায়নকালে বাঁধের ওপর শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গল্পটিতে সংযোজন করেছে প্রতীকী মাত্রা। সর্বহারা মানুষের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্বকে উপজীব্য করে ইলিয়াস যেসকল গল্প রচনা করেছেন সার্বিক বিচারে 'দখল' গল্পটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। গল্পটিতে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংঘাত অর্জন করেছে প্রত্যক্ষ রূপাবয়ব। গল্পটিতে একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে বাংলাদেশের শোষিত ও বঞ্চিত কৃষক ও গ্রামের মানুষের মুক্তির সপক্ষে সংগ্রামের প্রবাহমানতাকে (প্রবহমানতাকে) – শ্রেণিদ্বন্দ্বকে বাস্তব ভূমি থেকে বিচার ও বিশ্লেষণের সযত্ন প্রয়াস রয়েছে।' (আলাউদ্দিন, ২০১৬: ১২৯) বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় গ্রামীণ জোতদার সর্বগ্রাসী শোষণ এবং সেই শোষণশৃঙ্খল ছিন্ন করবার প্রচেষ্টায় সমবেত মানুষের ঐক্যবদ্ধ জাগরণ এ গল্পের মৌল প্রণোদনা।

'দখল' গল্পের ঘটনাবৃত্ত যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সেই মোয়াজ্জেম হোসেন সুবিধাবাদী এবং গ্রাম্য জোতদার শ্রেণির প্রতিভূ। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ আমলেও ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে নিম্নবিত্ত ও নির্বিত্ত মানুষের ওপর সে বজায় রাখে তার নিরঙ্কুশ শোষণক্রিয়া। নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্র্য ও শ্রমকে পুঁজি করে নিজের বিত্তবৈভবকে সে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি জমিদারি প্রভাববলয় অক্ষুণ্ন রাখতে শ্রমজীবী মানুষের ওপর সে অবতীর্ণ হয় অত্যাচারীর ভূমিকায়। আবার কখনো বা রাষ্ট্রযন্ত্র তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও সম্পৃক্ত করে তার শোষণক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে। তার অধীনে যারা বছরকামলা খাটে তাদেরকেও সে প্রয়োজনীয় আহার-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। দূর অতীতে ব্রিটিশ আমলেও ভূমিহীন বর্গাচাষি আকালুর ওপর তার এই শ্রেণিশোষণের স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়:

> চিথুলিয়ায় বিলে তখন পানি ছিলো, ... সেই বিলে একবার নৌকায় ডাকাতি হয়। ইনকুয়ারি করতে আসে বড়ো দারোগা নিজে। মোয়াজ্জেম কাজীর লিস্ট দেখে পুলিশ এ গ্রাম ও গ্রাম তছনছ শুরু করে। সেই লিস্টে সেবার ১ নম্বরে ছিল আকালু পরামাণিকের নাম। না, আকালু যে ডাকাত ছিলো তার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নাই, তবে লোকটা ভয়ানক বেয়াদবি শুরু করেছিলো। হ্যাঁ, তাদের জমিতে বর্গা চাষ করতো, বিলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাদের জমিতেই তার বসবাস। কিছুদিন হলো শালা ফসল দিতে গোলমাল করছিলো। এমনকি বিয়েশাদি কি উৎসবে বেগার খাটতে জবাব দেয়। 'দুইবেলা ভাত না দিলে কাম করা যাবি না!' নেমকহারাম-টাকে একটু শাস্তি দেয়ার জন্য তার নামটা ঢোকাতে হয়। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২১৭)

আকালুর মতো ভেদু পরামাণিক—যে কিনা বংশ পরম্পরায় মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে চাকর হিসেবে কর্মরত ছিল, তীব্র অভাবের দিনে তার জমি বিক্রির সিদ্ধান্তকেও মোয়াজ্জেম হোসেন 'নিমকহারামি' হিসেবে চিহ্নিত করে। মোয়াজ্জেম হোসেন কেবল তার পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে না, বরং পুলিশের গুলিতে শহিদ বড় ছেলে মোবারক হোসেনের স্ত্রী-পুত্রকেও সে তাদের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। 'শরিয়তে এরকম বিধান নাই। বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত

পুত্রের ছেলেমেয়ে কিছুই পায় না।' (ইলিয়াস, ২০১৬: ২১৪) সামন্ত মানসিকতাসম্পন্ন মোয়াজ্জেম হোসেনের নীচতা ও শঠতার এমন নানা নিদর্শন প্রযুক্ত হয়েছে গল্পটিতে। ক্ষমতালোভী মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের পক্ষে যোগ দিয়ে নিজ বাড়িতেই গড়ে তোলে মুসলিমলীগের অফিস। বড় ছেলে মোবারক হোসনকে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করে তাকে সমর্পণ করে মুসলিম লীগের ছাত্রনেতা ইয়াসিন সাহেবের হাতে। অপরদিকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তার মেজো ছেলে মোতাহের হোসেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে যোগদান করে রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে গড়ে তোলে সুসম্পর্ক। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পালাবদল সত্ত্বেও সুবিধাবাদী মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবার সর্বদাই ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে থাকে সম্পর্কযুক্ত। আর এ সম্পর্কসূত্রেই নির্মিত হয় শ্রেণিশোষণের ভিত। কিন্তু তারই বড় ছেলে মোবারক হোসেন যৌবনে কলেজে অধ্যয়নকালে বিপ্লবী ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে কৃষকের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। ভারত বিভাগোত্তরকালে কৃষকদের সংঘবদ্ধতার প্রচেষ্টায় কারা-অন্তরিন হয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও কৃষকের অধিকার আদায়ে তার উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ পরবর্তীকালে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার বৈপ্লবিক প্রেরণা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে সামন্তশোষণ ও শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে শহিদ মোবারক হোসেনের সহযোদ্ধা ভেদু পরামাণিকের নেতৃত্বে বগুড়া শহরের পার্শ্ববর্তী কাঁঠালপোতা, শিবহাটি, গুনাহার, তেলিহার প্রভৃতি গ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চকিত হয় তীব্র প্রতিবাদ। বিশেষত চিথুলিয়া বিলের ধানকাটাকে কেন্দ্র করে সাধারণ কৃষকশ্রেণি ও মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবারের মধ্যে সম্মুখ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় মোয়াজ্জেম হোসেন বিলের প্রায় সিকি ভাগ জমিতে ধান চাষ করলে রাতারাতি পাকা ধান কেটে নিয়ে যায় পশ্চিমের 'চাষারা'। মূলত যুগান্তরব্যাপী শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকশ্রেণির এটিই ছিল প্রথম সচেতন পদক্ষেপ। মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তার পুত্র মোতাহার হোসেন এ সমস্যা সমাধানে স্বাধীন দেশের বিচারব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ প্রদান করলেও সংগ্রামী কৃষকশ্রেণি তাতে কর্ণপাত করে না; বরং স্বাধীন দেশের পতাকাশোভিত কোর্ট কেও তারা ক্ষমতাবানদের সহায়ক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সমবেত কৃষকশ্রেণির এ জাগরণ শোষকশ্রেণির বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ হয়:

> মোতাহার হোসেনের বিরক্ত হবার আর ১টি কারণ হলো এই যে, এইসব নেমকহারাম চাষীদের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলার যো নাই। দেখো না, বিলের পশ্চিমে এতগুলো গ্রাম, ভদ্রলোকের ঘর ১টাও নাই। বাবা এখন তো স্বাধীন দেশ, এখন জমিজমা নিয়ে কোনো খটকা বাধে তো স্বাধীন দেশের বিচার আছে। কোর্টে যাও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও। যে সবুজ ও লাল পতাকার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলো সেই পতাকাশোভিত কোর্টের প্রতি এত অবহেলা কেন? (ইলিয়াস, ২০১৬: ২২১)

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও এদেশের নিম্নবর্গ ও ভূমিহীন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটেনি। উপরন্তু সমাজপরিসরে নতুন মাত্রা পেয়েছে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণির শোষণ-তৎপরতা। ফলে সর্বপ্রকার শোষণ-বঞ্চনার অবসানকল্পে সাধারণ কৃষকশ্রেণি জোতদার ও তাদের সহযোগী রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নব-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শোষিত মানুষের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে সর্বসাধারণের এ কর্মোদ্যোগে মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার ছেলের প্রভাব ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বিপুল মানুষের ঐক্যবদ্ধ জাগরণ ও প্রতিরোধের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় তারা রক্ষিবাহিনীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু গ্রামবাসীর সচেতন কৌশলে পরাভূত রক্ষিবাহিনী চলে যায় ভিন্ন পথে। শ্রেণিশত্রুবিনাশে সোচ্চার হাজারো গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয় মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ির অভিমুখে। মোবারক হোসেনের ছেলে ইকবাল প্রত্যক্ষ করে সেই সংক্ষুব্ধ জনস্রোত এবং শোষকশক্তির আসন্ন পরাভবের চিত্র:

> মানুষ আসছে। সামনে কয়েকজনের হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। পেছনে হাজার হাজার মানুষের হাতে কাস্তে, সড়কি, লাঠি ও দা। ইকবাল এটুকু জানে যে, এই গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ বড়োজোর সকাল পর্যন্ত টিকবে। বগুড়া কি রংপুর শহর থেকে রক্ষিবাহিনীর বড়ো দল আসছে। রক্ষিবাহিনীতে না কুলালে সেনাবাহিনী আসবে। কিন্তু তারা আসার আগেই এই বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল ওর বাপের কবর। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৩০)

শ্রেণিদ্বন্দ্বে আকীর্ণ শোষিত মানুষের কথা ইলিয়াসের বেশকিছু গল্পে চিত্রিত হলেও শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মানুষের শ্রেণিগত উত্থানের চিত্র কেবল 'দখল' গল্পেই প্রদর্শিত হয়েছে। শৈল্পিক নিরাসক্তির পরিবর্তে ইলিয়াস এ গল্পে সমষ্টিগত দায়িত্বচেতনায় নিপীড়িত মানুষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। যুগান্তরের শ্রেণিশোষণে ক্ষতবিক্ষত মানবগোষ্ঠীর মুক্তি-প্রত্যাশা ও দীপ্র আবেগের শৈল্পিক রূপায়ণে 'দখল' গল্পটি অনবদ্য।

কীটনাশকের কীর্তি

আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিচারে দুটি ভিন্ন শ্রেণি, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং সেই সঙ্গে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা 'কীটনাশকের কীর্তি গল্পের উপজীব্য। এ গল্পের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রত্যন্ত পল্লিগ্রাম পর্যন্ত। জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে আগত দরিদ্র কৃষকপুত্র রমিজ আলী ও তার পরিবারের মর্মন্তুদ জীবনবাস্তবতার চিত্র গল্পটির বিষয়াংশে উপস্থাপিত হয়েছে। বিত্তশালী পরিবারের ভৃত্য রমিজ আলি পিতার পত্রসূত্রে জানতে পারে কীটনাশক পানে বোন অসিমুন্নেসার আত্মহত্যার খবর। বোনের আত্মহত্যার বিষয়টি মিটমাট করতে এবং গ্রামের আসমত আলী মৃধার পাওনা পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার কথাও সে জানতে পারে পিতার পত্রের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় রমিজ আলি টাকার জন্য মালিকের নিকট উপস্থিত হলেও

মালিকের কাছে সে তার বক্তব্য উত্থাপন করতে পারে না। পিতার চিঠিতে বোনের আত্মহত্যার কার্যকারণ অনুল্লেখিত থাকলেও রমিজ তা অনুধাবনে সক্ষম হয়। গ্রামের মৃধাবাড়ির কয়েক পুরুষের চাকর রমিজের পরিবার। এই পরিবারের পুরুষেরা মৃধাবাড়ির জমি বর্গাচাষ করে এবং স্ত্রীরা অন্দরমহলে গৃহপরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মৃধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাসের সঙ্গে রমিজ আলির বোন অসিমুন্নেসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার একপর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে পড়লে কিসমত হাজির ছেলে ম্যাট্রিকপাস গা ঢাকা দেয়। এ পর্যায়ে ম্যাট্রিকপাসের পিতা কিসমত হাজির উদ্যোগে ছেলের দোকানে নিযুক্ত কর্মচারী হাফিজুদ্দির সঙ্গে অসিমুন্নেসার বিয়ে সম্পন্ন হয়। অসিমুন্নেসা ও হাফিজুদ্দির দাম্পত্যজীবন শান্তিতে অতিবাহিত হলেও দিন পনেরো পর অসিমুন্নেসার ঘরে ম্যাট্রিকপাসের আগমন ঘটে। অসিমুন্নেসা তাকে দেহদানে অস্বীকৃতি জানালে নিজের অসংযত বাসনা চরিতার্থ করতে ম্যাট্রিকপাস হাফিজুদ্দিকে প্রথমে মানিকগঞ্জে এবং পরবর্তীকালে ঢাকায় পাঠায়। আত্মরক্ষার তাগিদে অসিমুন্নেসাও পালিয়ে আসে তার বাবার বাড়িতে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয় না। পরবর্তী ঘটনাসমূহ চলতে থাকে ম্যাট্রিকপাসের অদৃশ্য ইশারায়। ম্যাট্রিকপাসের প্ররোচনায় হাফিজউদ্দিন তার শ্বশুরের নিকট যৌতুক হিসেবে একটি সাইকেল দাবি করে, অন্যদিকে ম্যাট্রিকপাস নিজেও গ্রামপরিসরে অসিমুন্নেসার বিয়ের পূর্বে গর্ভবর্তী হওয়ার বিষয়ে 'ফতোয়া প্রচার করে। যদিও তার বীজ গর্ভে ধারণ করেই অসিমুন্নেসার এ পরিণতি। সামাজিক লাঞ্ছনা ও অপবাদ থেকে মুক্তিপ্রয়াসে স্বামী-পরিত্যক্ত অসিমুন্নেসা শেষাবধি বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ।

একদিকে বোনের আত্মহত্যার সংবাদপ্রাপ্তি এবং অন্যদিকে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ভাবনা রমিজকে বিচলিত করে তোলে। চিঠিপ্রাপ্তির পর নানা টুকরো স্মৃতিসূত্রে বোনের আত্মহত্যার প্রকৃত কার্যকারণ অনুসন্ধান করে সে এজন্য দায়ী ম্যাট্রিকপাসকে দায়ী করে, এবং তাকে শ্রেণিশত্রু হিসেবে গণ্য করে। হাফিজুদ্দি অসিমুন্নেসাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানালে তা সমাধানে সে উদ্যোগী হয়ে ম্যাট্রিকপাসের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু শ্রেণি-অবস্থানগত কারণে ম্যাট্রিকপাস মনিবের সম্মুখে এ বিষয়ে একটি কথাও তখন সে উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। বোনের আত্মহত্যার সংবাদপ্রপ্তির পর রমিজের অন্তর্লোকে প্রতিশোধের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। কল্পনায় সে ম্যাট্রিকপাসের ওপর চড়াও হয়:

> তাপর শালার চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই নাকে ধমাধম কয়েকটা ঘুষি লাগাও। লাগাও ঘুষি। লাগাও। নাকের হাড্ডি ভেঙে গুঁড়ো করে দাও। শুওরের বাচ্চা নিশ্বাস নিবি কী করে দেখবো। ঘুষি লাগালেও শয়তানটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না রমিজ, কারণ হাজার হলেও লোকটা ওদের মনিব বললেই চলে। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪০)

কিন্তু বাস্তবে ক্ষমতা ও বিত্তে বলশালী ম্যাট্রিকপাসের শাস্তিবিধান তার পক্ষে সম্ভব না। এছাড়া তার আজন্ম সংস্কার-শাসিত মানসিকতাও তাকে 'মনিব' ম্যাট্রিকপাসের

বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। ফলে বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা তার অন্তর্লোকেই থেকে যায়। এক পর্যায়ে সে শহুরে সাহেবের পরিবারকে শ্রেণি-অবস্থান বিচারে ম্যাট্রিকপাসের সমগোত্রীয় বিবেচনা করে তাদের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। মালিকের ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়ে শাম্মির ঠোঁটে পোকার ওষুধ গুঁজে দেওয়ার অবিচল লক্ষ্যে সে এগিয়ে যায়। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে সে নির্মম প্রহারের শিকার হয়। প্রথমিক পর্যায়ে রমিজ মালিকের পরিবারকে শ্রেণিশত্রু হিসেবে বিবেচনা করেনি বরং মালিকের স্ত্রী বিবিসায়েবের সহায়তায় সে হাফিজুদ্দি ও ম্যাট্রিকপাসের শাস্তি বিধানে তৎপর হয়। এ বিষয়ে তার ভাবনা ছিল:

> পুরুষমানুষের শয়তানি বন্ধ করার ফন্দি শেখার জন্য বিবিসায়ের একেকবার বিলাত লন্ডন এ্যামেরিকা বোম্বাই কোথায় কোথায় যায়...। হাফিজুদ্দিকে যদি একবার এখানে এনে বিবিসায়েবের সামনে ফেলা যায় তো শালার হাড্ডিমাংস এক করে বস্তায় পুরে তেঁতুলতলায় পুঁতে রাখার সুবিধা হয়। কিন্তু তেঁতুলতলা দখল করে থাকে শালা ম্যাট্রিকপাস।—এবার রমিজ একটু দমে গেলো। ম্যাট্রিকপাস শিক্ষিত লোক, তার ওপর জমিজমা হালগোরু, কিষাণপাট, সিঙাইড়ে মনিহারির দোকান, পাটের আড়ত। তাকে ধরা কি সোজা কথা?—তা বিবিসায়েবের খাতির তো আরো কতো বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে। বিবিসায়েবের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে হুকুম করো দারোগাকে, কী?—না বিবিসায়েবের হুকুম, মানে তোর বাপের হুকুম, বাপের বাপ মন্ত্রী প্রেসিডেন্টের হুকুম, ধরে নিয়ে আয় শালা মৃধাবাড়ির ভাদাইম্যা শয়তানটাকে। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪০)

কিন্তু ‘পুরুষ মানুষের জুলুম বন্ধের জন্য বিবিসায়েবের’ দলটির মাথাব্যথা কেবল ‘গরিব গরবা ছোটোলোকদের মেয়েদের’ নিয়ে। জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে দলটির আচরণে শ্রেণিচেতনা ও কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করে রমিজ। তাদের প্রচারসর্বস্ব জনসেবা, নারীর মানোন্নয়ন ও নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের ক্রিয়াকর্মের অসারতা লক্ষ করে বিবিসায়েবের মাধ্যমে ম্যাট্রিকপাসের শাস্তিবিধানের সিদ্ধান্ত থেকে সে সরে আসে।

একদিকে বোন অসিমুন্নেসার মৃত্যুজনিত সমস্যার সমাধান করতে না পারা, অন্যদিকে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার প্রসঙ্গ মালিকের সম্মুখে উত্থাপন করতে না পারা—এই দ্বিবিধ ব্যর্থতা রমিজকে পরিণত করে অজৈব সত্তায়। ফলে তা থেকে মুক্তিপ্রয়াসে সে শ্রেণিশত্রু হিসেবে সায়েবের পরিবারকে চিহ্নিত করে এবং তাদের মেয়ে শাম্মিকে হত্যার পরিকল্পনায় কৃতসংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় নিজের বোনের মৃত্যু আর তার বিপরীতে শাম্মির প্রাণচঞ্চল জীবন রমিজকে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ করে তোলে। একসময় শাম্মির মধ্যে নিজের বোনের ছায়া লক্ষ করেছিল রমিজ। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করে শাম্মি এবং তার বোন অসিমুন্নেসার শ্রেণি-অবস্থানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান এবং সায়েবের পরিবারের সঙ্গে তার পরিবারের চেয়ে বরং মৃধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাসের পরিবারের সাযুজ্য

অধিক, তখনই সে সায়েবের কন্যাকে হত্যায় উদ্যত হয়:

> দেরি করা মানেই ঝুঁকি নেওয়া। মাগীকে ধরে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ধরে তার পাতলা ও ফ্যাকাসে ফর্সা মুখে পোকার ওষুধ চালান করে দেওয়ার মোক্ষম সময় চলে যাচ্ছে। এইবার মাগী তোরে বাঁচায় ক্যাডা।—রমিজের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। এক হাতে পোকা মারা ওষুধ, অন্য হাতে সোনার মেডেল, রমিজ আলি হরণ করে নিয়েছে তার নাচে কৃতিত্বের সাক্ষীকে। অহন নাচবার তো দূরের কথা, হাঁটবার নি পারস? মুখের মইদ্যে চাবাইয়া চাবাইয়া চাপা নি মারবার পারস। ... আর বসে থাকা যায় না।—না আর না। সায়েবের মেয়ের ঠোঁটের সুড়ঙ্গ দিয়ে সমস্ত ভার গলিয়ে না দিলে বুবুকে ঠাঁই দেবে কোথায়। (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪৬-২৪৭)

কেবল সায়েবের কন্যা নয়, সায়েব এবং সায়েবের স্ত্রীকেও সে হত্যা করতে চায়; হত্যা করতে চায় কোরবান মেম্বার ও তার বাবাকে। বলা যায়, তাবৎ পৃথিবীর সকল শ্রেণিশত্রুর বিনাশে রমিজ সোচ্চার ও সংকল্পবদ্ধ। কারণ, রমিজের বিশ্বাস এ শ্রেণিশত্রুদের বিনাশের মধ্য দিয়েই কেবল সে বোনকে 'খালাস' করতে পারে।

এ গল্পে রমিজের শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিশত্রু বিনাশের ক্ষেত্রে তার উদ্যোগ সমালোচক মহলে বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে গল্পের নামকরণ[৭] 'কীটনাশকের কীর্তি' নিয়েও। সমষ্টিবিচ্ছিন্ন ও পোকামাকড়সদৃশ অকিঞ্চিৎকর জীবনে অভ্যস্ত রমিজ তার পরিবারের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকেও নামিয়ে আনতে চায় নিজের সমান্তরালে। শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় পরিচালিত হয় রমিজের কীর্তি। ফলে আমাদের বিবেচনায় এ গল্পের নামকরণে লেখকের যৌক্তিক বিবেচনাবোধ প্রযুক্ত হয়েছে; যা গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে হয়ে উঠেছে একান্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। রমিজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে তার জাগরণ ও উজ্জীবন 'কীটনাশকের কীর্তি'কে অসামান্যতা দান করেছে।

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রাজনীতিমনস্কতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'ফোঁড়া' গল্পে। বাংলাদেশে বামরাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের অমোচনীয় দূরত্ব এবং নিম্নবিত্ত মানুষের অনিঃশেষ দুর্দশার চিত্র গল্পটির উপজীব্য রিকশাচালকের ফোঁড়ার রূপকে ইলিয়াস সমাজদেহস্থিত ক্ষতকে চিহ্নিত করেছেন, যে ক্ষত নিরাময়ে শ্রমজীবী মানুষের আত্মসচেতনতার বিষয়টি হয়ে উঠেছে এ গল্পের প্রধান উপজীব্য।

'ফোঁড়া' গল্পে বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী মামুনের দর্পণে দেশের নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দূরত্বের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। নাইমুদ্দিন কিংবা রিকশাচালকের মতো শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের

আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সঙ্গে মামুনদের দূরত্ব বরং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে নিজের ফোঁড়ার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য রিকশাচালকের সচেষ্ট হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়—সমাজ-অন্তর্গত দ্বন্দ্বসমূহের নিরসনে অনিবার্য শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামী সক্রিয়তা।

মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অনুস্বাক্ষরে ঋদ্ধ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্প। এদেশের ক্ষমাতাকাঠামো, শ্রেণি-অবস্থানের রূপ-রূপান্তর গল্পটির মৌল প্রতিপাদ্য। শ্রেণিদ্বন্দ্ব এ গল্পে পূর্বাপর ক্রিয়াশীল থেকেছে। বস্তিবাসী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবার এবং দেশবিরোধী পাকিস্তানি অনুচরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব গল্পটিতে ভিন্নমাত্রা সম্পাদন করেছে এবং চরিত্রগুলোর নানামুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সূত্রসমূহ। গল্পের ঘটনাক্রম বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দুই দশক অতিক্রান্তির পর যখন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধশক্তি ক্রমেই শেকড় সঞ্চারিত করেছে এদেশের সমাজদেহে। রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং গণতন্ত্রহীনতার সুযোগে এ শ্রেণিটি রূপান্তরিত হয়েছে সমাজনিয়ন্ত্রক শক্তিতে। মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কীভাবে একটি স্বাধীনদেশের নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয় সেই সীমাহীন মর্মযাতনার ঐতিহাসিক বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে গল্পটির ঘটনাংশে।

'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের ঘটনাধারায় এদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তরকালের বাস্তবতার একটি নির্মোহ পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নময় জীবনাকাঙ্ক্ষাও আত্মত্যাগের পাশাপাশি গল্পে স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রমপ্রতিষ্ঠা সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। লালমিয়াও তার বাল্যবন্ধু ইমামুদ্দিন একই পরিবেশে বেড়ে উঠলেও মনোগঠনে তারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক-পর্যায়ে প্রেস-কর্মচারী ইমামুদ্দিন ভারতে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত করে বিভিন্ন গোপন অভিযান। এরকমই এক অভিযানে রথখোলার মোড়ে ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়ে পালানোর সময় মিলিটারির গুলিতে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি মিলিটারির অনুচর নাজির আলি পাকিস্তানি মিলিটারির আগ্রাসনকে স্বাগত জানিয়ে সংখ্যালঘু শ্রেণির সম্পদলুটের মহোৎসবে মেতে ওঠে। মিলিটারির গুলিতে ইমামুদ্দিনের মৃত্যু হলে নাজির আলি বস্তিতে মিলিটারি ডেকে পাঠায়। পাকিস্তানি মিলিটারি ইমামুদ্দিনের দাদীকে হত্যা করে তার স্ত্রী ও ভাইকে তুলে নিয়ে যায়। নাজির আলি অত্যন্ত কৌশলে এ ঘটনায় ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বছর শেষে 'শীতের ভেতর কুয়াশার রোদ জ্বালিয়ে' যুদ্ধজয়ী ছেলেরা পাড়ায় ফিরলে নাজির আলি নিরুদ্দিষ্ট হয়। স্বাধীনদেশে মিলিটারি শাসন শুরু হলে নাজির আলি ও তার পার্টির সেই সকল সদস্য পুনর্বাসিত হতে শুরু করে যারা যুদ্ধের শেষদিকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ছিল প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। নাজির আলি এবং অন্যান্য রাজাকারশ্রেণির পুনর্বাসনে

লালমিয়ার অন্তর্জগৎ বেদনাদীর্ণ হয়। সে ক্রমাগত স্বপ্নে এক বুড়ো মুরুব্বি মুসল্লিকে আবিষ্কার করে যার পায়ের পাতা পিছন দিকে ফেরানো এবং যার সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় মহাজন নাজির আলির। একসময় বুলেটের মধ্যেও এ স্বপ্ন অনুপ্রবিষ্ট হলে বুলেট নিশ্চিত হয় 'শাহ্ সাহেবের পায়ের ব্যারাম আছে' (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৭৩) এবং এ পা নিয়ে মানুষের পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। 'আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনারা আপনাগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?' (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৭৪) বুলেটের বিবেচনায় পায়ের পাতাজোড়া মেরামত করতে হলে ওগুলো আগে কেটে ফেলা দরকার। ওলটানো পা-ওয়ালা পার্টির সদস্যরা স্বপ্নের মধ্যে বুলেটের দিকে তেড়ে আসলে বুলেট তাদের দিকে ছুড়ে দেয় প্রস্রাবের তীব্র বেগ। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীটি ঢুকে পড়ে তাদের অদৃশ্য আখড়ায়। এভাবে গল্পটিতে বাস্তব আর স্বপ্নের সংমিশ্রণে ইলিয়াস মূলত মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজগতির রূপ-রূপান্তরকে চিত্রিত করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রমপ্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অপদশা স্বাধীন বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। মুক্তিযুদ্ধকালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নাজির আলির মতো সুযোগসন্ধানী সাম্প্রদায়িক শক্তির সম্পদ লুণ্ঠনের কর্মযজ্ঞ ইতিহাসস্বীকৃত বিষয়। গল্পে নাজির আলি পর্যায়ক্রমে দখল করেছে ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকান, রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মনিহারির দোকান এবং কার্তিকবাবুর লন্ড্রি। বস্তিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিন এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সপক্ষে অবস্থান নিয়ে নাজির আলির কর্মকাণ্ডের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং তার আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে বন্ধু লালমিয়াকেও সে সতর্ক করে:

> 'দুইটা মাস বাদে তর মাহাজন খানকির বাচ্চারে না ধইরা ভিক্টোরিয়া পার্কের মইদ্যে একটা গাছের লগে না বাইন্দা অর হোগাখানের মইদ্যে বন্দুক একখান ফিট কইরা গুলিটা করুম আমি নিজে, বুঝলি? অর রোয়াবি থাকবো কৈ? এই লন্ড্রি দখল করছে, এইটা অর থাকবো? মালিকে আইয়া লাথি মাইরা উঠাইয়া দিবো না?'... 'কার্তিকবাবুরে মিলিটারি তো পয়লা দিনই মাইরা ফালাইলো। অর পোলাপানে কি আর ইন্ডিয়া থন আইবো?' ইমামুদ্দিন পালটা গলায় জিগ্যেস করে 'আইবো না?'... 'না আইলে কী? গরিব মানুষের মইদ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবো। তর মাহাজনে নবেন্দু বসাক লেনের মইদ্যে রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মনিহারির দোকান দখল করছে; ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকান মিলিটারি পুড়াইয়া দিলো, ঘরটা দখল করল তর মাহাজনে। খানকির বাচ্চা আর দুইটা মাস ভি এইগুলি রাখবার পারে নাকি দ্যাখ্। (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৫৭-৩৫৮)

কিন্তু মিলিটারির গুলিতে ইমামুদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যু হলে নাজির আলির দাপট আরো আগ্রাসী হয়। বস্তিতে মিলিটারি ডেকে পাঠিয়ে সে তার অপকর্মের বিরোধিতাকারী ইমামুদ্দিনের পরিবারকে ধ্বংসের প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়। পাকিস্তান মিলিটারি ইমামুদ্দিনের

বউকে ধরে নিয়ে গেলে তার সমর্থনে নাজির আলির বক্তব্যে তার শ্রেণিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> ... আমার দীনের জন্যে হাজার মাইল দূর থেকে মিলিটারি এসে জান কোরবান করে দিচ্ছে, তাদের শরীরের তো কিছু চাহিদা থাকে। সেটুকু মেটাতে না পারলে নিমকহারামি করা হয় না? (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৬৩-৩৬৪)

পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে নাজির আলি মূলত আত্ম-উন্নয়নের পথকেই প্রসারিত করে। স্বাধীনতার সূচনালগ্নে সে আত্মগোপনে থাকলেও তার কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয় না। মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে সে হয়ে ওঠে বিপুল সম্পদের মালিক। তার ছেলেরা এ পর্যায়ে দখলে নেয় লালমিয়ার অধীনে থাকা লন্ড্রির দোকান। দেশান্তরিত ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকানটিও চলে যায় কোনো এক এম.পি-র করায়ত্তে। অর্থাৎ সম্পদের সুষমবণ্টনের পরিবর্তে দখলদারিত্ব হয়ে ওঠে স্বাধীনদেশে সম্পদের হাতবদলের মাধ্যম। আবার স্বাধীনতার গৌরবময় উত্তরাধিকার বহন করেও নাজির আলির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পায় না বুলেট। ভবঘুরে জীবনে সে টিকিট কালোবাজারি, বাসের হেলপারি, হোটেলে খাবার চুরি কিংবা অফিসের বাবুদের টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার চুরি করে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। বুলেটের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তার পরিবারের নামে বরাদ্দকৃত বাড়িটিও দখল করে নেয় নাজির আলি। এমনকি বুলেটের ফিরে আসাকেও সে নিজস্বার্থে ব্যবহার করে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে সামনে রেখে স্বাধীনদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সমস্ত সুযোগ নাজির আলি দুহাতে আত্মসাৎ করে। পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পুঁজি করে ক্ষমতাবান হওয়ার সুপ্ত অভিপ্রায় লক্ষ করা যায় তার ভাবনালোকে:

> ... একটা শহিদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মানে একটা অ্যাসেট, কখন কী হয় কে জানে? যদি তেড়িবেড়ি করে তখন দেখা যাবে। ঘাপটি মেরে থাকার সময় মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে যে টাকা করেছে তা কি ব্যাঙ্কে জমাবার জন্যে? গার্মেন্টস চালু হলে তো কথাই নাই। এই মহল্লা কিনে নিতে তখন তার কতক্ষণ? তখন এই বুলেট তো বুলেট, তার মুরুব্বি যে লালমিয়া তাকেও লাথি মেরে বের করে দিতে একটুও বেগ পেতে হবে না। আরে, এইগুলি হইল প্যাসারের ফেনা—এই আছে, এই নাই। কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে নাজির আলি প্রস্রাবের বিলীয়মান হাল্কা হলুদ ফেনায় বুলেট আর লালমিয়াকে একসঙ্গে বুদ্‌বুদে মিলিয়ে যেতে দেখে। (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৭০)

নাজির আলির অর্থ ও ক্ষমতার দাপটের বিপরীতে বুলেট কিংবা লালমিয়া নিতান্ত অসহায়। কিন্তু এ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের অন্তর্গত ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত আভাসিত হয় তাদের স্বপ্নের মাধ্যমে। 'স্বপ্ন ইলিয়াসের গল্পে অবদমিত ইচ্ছার উদ্দীপক।' (সুশান্ত, ২০১৮:

২৬১) বাস্তবে যেখানে নাজির আলির বিরুদ্ধাচরণ অকল্পনীয় সেখানে স্বপ্নের জগৎ হয়ে ওঠে বুলেটের জন্য প্রতিশোধের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর 'পায়ের ব্যারমে'র প্রতিবিধানে বুলেটের সক্রিয়তাকে গল্পকার এদেশের জাতীয় চেতনার সমগ্রতায় একীভূত করেছেন। যুদ্ধোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা-অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটের মধ্যেও সূক্ষ্ম আশাবাদের ব্যঞ্জনায় গল্পটি রূপকীয় বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

ইলিয়াসের গল্পে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি উন্মোচিত হয়েছে সময়, সমাজ ও জীবনসত্যের মর্মকথা। শ্রেণিশাসিত বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঘাত-সংঘাতময় অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের নিপুণ বিন্যাসে সমাজজীবনের গুণগত পরিবর্তনের প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গল্পসমূহে। কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদ বা মতাদর্শ সেখানে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়নি। অবশ্য সবকিছু ছাপিয়ে লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও সমাজপরিবর্তনের মৌল আকাঙ্ক্ষাই এই গল্পসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

টীকা

১. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস জানিয়েছেন: 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।' (কার্ল মার্কস ও ফেড্রিক এঙ্গেলস, ১৯৭৫: ২৬)

২. গোপাল হালদারের মতে: 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে কোনো সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা।' (গোপাল, ১৯৭৪: ১৮৬)

৩. আলাউদ্দিন মণ্ডলকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস সম্পর্কে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মন্তব্য করেছেন: 'ইলিয়াস রক্তে রক্তে মার্কসিস্ট ছিল, কিন্তু যখন শিল্প করতে গেছে তখন সে মার্কসিজম করেনি। লেখক শিবিরে যোগদান ভালোই হয়েছে – সেখানে সে মার্কসিজমের মধ্যে গেছে কিন্তু মার্কসিজমের তাত্ত্বিকতার মধ্যে, তত্ত্বসর্বস্বতার মধ্যে যায়নি, সে জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে। ... তত্ত্বকে অতিক্রম যে সেটা করতে পারে সেই-ই তো শিল্পী। এইজন্য ইলিয়াস শিল্পী।' (আলাউদ্দিন, ২০০৯: ৫৭৫)

৪. শাহাদুজ্জামানকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানিয়েছেন: 'অনেক আগে সেই প্রথম দিককার আমার একটা গল্প আছে একটা ছেলে মাস্টারবেশন করছে এবং তার পরিচিত একটা বড়লোকের মেয়েকে কল্পনা করছে কিন্তু কল্পনায় সে কিছুতেই সে মেয়েকে পুরোপুরি আনতে পারছে না। সে কোনোদিনও পারবে না, কারণ ঐ মেয়েটা তার রেঞ্জের অনেক বাইরে। বাস্তবে সে কখনোই ঐ মেয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে না। এই রেঞ্জটাই হলো ক্লাস কনসাসনেস, সেক্সুয়াল ইমাজিনেশনের সঙ্গেও ক্লাসের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।' (শাহাদুজ্জামান, ২০০৭: ৮৪)

৫. পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস বক্তব্য: '... সেক্সও যে শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনেক কম্যুনিস্ট তা বুঝতে চায় না।' (শাহাদুজ্জামান, ২০০৭: ৮৪-৮৫)

৬. যথাস্থিতবাদী দর্শনের ভিত্তি ডারউইন-পরবর্তী জীববিজ্ঞানের এ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষ কেবলমাত্র উন্নতশ্রেণির এক প্রাণী যার সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের বাইরেকার কোনো অধ্যাত্ম ভাবলোকের কোনো সম্পর্ক নেই এবং মানুষের চরিত্র ও ভবিতব্য সবকিছু নির্ধারিত হয় দুটি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা—একটি 'বংশগতি' (heredity), অন্যটি 'পরিবেশ' (environment)। (কুন্তল, ২০১৮: ৪৩৮)

৭. সুশান্ত মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'অসিমুন্নেসার মরার সঙ্গে শাম্মীকে মেরে ফেলার সম্পর্ক কি? ... শ্রেণির ক্রোধই কি রমিজ আলির ভেতর কাজ করেছে?... মৃধারা গ্রামের আর সাহেব শহরের ধনী উভয়কে একই সমান্তরালে রেখে রমিজ আলি প্রতিশোধ নিতে চাইলেও গল্পের গোলকধাঁধা পাঠককে ধাঁধার ভেতরেই রেখে দেয়। গ্রাম ও শহর, আত্মহত্যা ও হত্যা, একই কীটনাশক, অসিমুন্নেসা ও শাম্মী মিলিয়ে যে সূত্র গড়ে ওঠে তার নাম 'কীটনাশকের কীর্তি' হতে পারে না।' (সুশান্ত, ২০১৬: ১২২)

আকর গ্রন্থ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ২০১৬। *রচনাসমগ্র-১*, মাওলা ব্রদার্স, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আলাউদ্দিন মণ্ডল, ২০১৬। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: পাঠকৃতির নন্দন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আলাউদ্দিন মণ্ডল, ২০০৯। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আসমা জাহান, ২০১৯। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে শ্রেণিচেতনা ও অস্তিত্ব অন্বেষা* (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, ১৯৭৫। *রচনা সংকলন* (প্রথম খণ্ড), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ২০১৮। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা।

গোপাল হালদার, ১৯৭৪। *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা।

জাফর আহমদ রাশেদ, ২০১২। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ।

মোছাঃ শামিমা নাসরিন, ২০১৬। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ* (এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০১৪। 'চিলেকোঠার সেপাই জীবনবোধ ও প্রকাশরীতির কয়েকটি দিক', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত *ঊষালোকে*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার

সেপাই ও খোয়াবনামা সংখ্যা, নব পর্যায় অষ্টম সংখ্যা, পৃ. ৪৮।

মোহাম্মদ হাননান, ১৯৯৪। *বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শাহাদুজ্জামান, ২০০৭। *কথা পরম্পরা*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

সরিফা সালোয়া ডিনা, ২০১০। *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুশান্ত পাল, ২০১৮। *উজান যাত্রার কথক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, পুনশ্চ, কলকাতা।

সুশান্ত মজুমদার, ২০১৬। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: দ্বৈরথ সমর', এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত *লিরিক*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিশেষ সংখ্যা, বাতিঘর, চট্টগ্রাম।

হাসান আজিজুল হক, ২০১৮। *আমার ইলিয়াস*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।